কয়লাসম্পদ ■ বদরুল ইমাম

উন্মুক্ত খনি, ভূগর্ভস্থ খনি নাকি গ্যাসীকরণ

বাংলাদেশের বর্তমান জ্বালানির সংকট যে এককভাবে গ্যাস দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়, এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। আর ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদাকে বিবেচনায় আনলে বহু ধারার জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দেশে গ্যাস ছাড়া অপর যে জ্বালানি সম্পদের উল্লেখযোগ্য মজুদ আবিষ্কার হয়েছে, তা হলো কয়লা। উত্তরবঙ্গে ১৯৬২ সালে জামালগঞ্জে প্রথম বিরাট কয়লা মজুদ আবিষ্কারের পর আজ অবধি দিনাজপুর-রংপুর এলাকায় আরও চারটি বড় আকারের কয়লার মজুদ আবিষ্কার হয়। এর মধ্যে কেবল দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়া ভূগর্ভস্থ কয়লার খনিতে ২০০৫ সাল থেকে সীমিত আকারে কয়লা উৎপাদন হচ্ছে। জ্বালানি-সংকটের এ দুর্দিনে দেশের কয়লা সম্পদকে ব্যাপকভাবে উত্তোলন করার কর্মপন্থা নেওয়া বা না-নেওয়ার বিষয়টি কেবল প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা ক্ষেত্রবিশেষে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায়। আর এ বিতর্কে দুটি পক্ষ তাদের নিজ অবস্থান ছাড়তে নারাজ। একপক্ষ মত প্রকাশ করে যে কয়লা সম্পদকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি নির্মাণ করা প্রয়োজন, যাতে করে ৯০ শতাংশ কয়লা সহজেই উত্তোলন করা যাবে এবং এ পন্থায় দেশের জ্বালানির সংকট বহুলাংশে মেটানো সম্ভব হবে। তাই এখনই উন্মুক্ত কয়লা খনি নির্মাণ আবশ্যক। অপর পক্ষ বলছে যে উন্মুক্ত খনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উত্তোলন সম্ভব বটে, কিন্তু তার ফলে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের যে সমূহ ক্ষতি হবে, তা মেটানোর কোনো উপায় নেই। তাই উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লা খনি বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। সুতরাং উন্মুক্ত কয়লা খনি করা যাবে না।

কয়লা খনি নির্মাণের আগে যেকোনো দেশেই পক্ষে-বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তাই বাংলাদেশে উপরিউক্ত বিতর্ক যে অপ্রত্যাশিত, তা নয়। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব অধিকতর এ কারণে যে একদিকে চরম জ্বালানির সংকট মেটাতে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার যেমন কাম্য, অন্যদিকে তেমন এ দেশের বিশেষ ভূপ্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশে উন্মুক্ত খনির মাধ্যমে ব্যাপক হারে কয়লা আহরণের সুযোগ সীমিত বা অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রণীত ও সর্বশেষ ২০০৭ সালে পেশ করা প্রস্তাবিত কয়লানীতির সূচনা পর্বে এ মত প্রকাশ করা হয় যে যেহেতু ১) বাংলাদেশের সব কয়লা মজুদ নরম উর্বর সমতল আবাদি জমির নিচে অবস্থিত, ২) এসব স্থান ঘন বসতিপূর্ণ, যেখানে চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ অন্যতম প্রধান উপায়, ৩) কয়লাস্তরের ওপর বিরাট পুরুত্বের পলিমাটি স্তর বিদ্যমান, যা খননে বড় আকারের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং ৪) কয়লা মজুদসমূহ অপেক্ষাকৃত গভীরতায় (১০০ মিটারের বেশি) বিদ্যমান, সেহেতু এসব কয়লা আহরণে রক্ষণশীল পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ বক্তব্যে উন্মুক্ত খনন প্রক্রিয়ায় কয়লা উত্তোলনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞ পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

আলোচনার এ পর্যায়ে ফুলবাড়ী কয়লা খনি প্রসঙ্গটি টেনে আনা প্রাসঙ্গিক হবে। এশিয়া এনার্জি কোম্পানি ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লা খনি তৈরির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ প্রধানত স্থানীয় জনগণের চরম আপত্তি। শুধু তা-ই নয়, দেশের বিশেষজ্ঞ মহলের বড় অংশ মনে করে যে ফুলবাড়ী এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক পরিবেশ উন্মুক্ত খনি স্থাপনার জন্য বাধাস্বরূপ। অনেকেই মনে করেন, এটি কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের যেকোনো দেশেই এ রকম প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপনে বিরোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। প্রকৃতপক্ষে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উদাহরণ নিলেও দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার অঞ্চলের কয়লা খনিসমূহ কোনোটিই উর্বর জমিতে বা এ রকম ঘনবসতি এলাকায় নির্মাণ করা হয়নি।

ফুলবাড়ীতে কয়লা খনি স্থাপনের বিষয়ে যে প্রশ্নটি আলোচিত হতে দেখা যায় না তা হলো ফুলবাড়ী কয়লা আবিষ্কারক অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি বিএইচপি সেখানে কয়লা আবিষ্কারের পর উন্মুক্ত খনি স্থাপন করেনি কেন? আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মাইনিং কোম্পানি বিএইচপির কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ্য সর্বজন স্বীকৃত এবং এর খনি নির্মাণ কর্মক্রম বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদশালী দেশজুড়ে বিস্তৃত। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিএইচপি বাংলাদেশে উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে কয়লা অনুসন্ধান করতে আসে। কিন্তু ১৯৯৭ সালে ফুলবাড়ীতে কয়লা আবিষ্কারের পরে উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপনের প্রশ্নে বিএইচপি অগ্রসর হতে দ্বিধা করে। এর কারণ বিএইচপি মনে করে, ফুলবাড়ী এলাকার ভূপ্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশে ১০০ মিটারের বেশি গভীরতায় অবস্থিত কয়লা উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে খনন করলে তা পরিবেশকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করবে, যা কি না অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশনীতির মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। বিএইচপি মনে করে, কয়লাস্তরের গভীরতা ১০০ মিটারের কম বা কাছাকাছি হলে তবেই এ দেশে উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপন সম্ভব। ফুলবাড়ীতে কয়লাস্তরের গভীরতা ১৫০ থেকে ২৫০ মিটার। পরে বিএইচপি ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্র এশিয়া এনার্জি কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করে দেশ ত্যাগ করে।

> বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ জ্বালানি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে। এ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশকে এখনই পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

ফুলবাড়ী কয়লার গভীরতা ১৫০ থেকে ২৫০ মিটার হওয়ার কারণে যদি তা উন্মুক্ত খনি স্থাপনের যোগ্য বলে বিবেচিত না হয়, তবে অপর কয়লাক্ষেত্রসমূহ যেমন খালাশপীর (গভীরতা ২৬০—৪৫০ মিটার) বা দীঘিপাড়া (গভীরতা ২৫০—৩৫০ মিটার) কোনোভাবেই উন্মুক্ত খনির যোগ্য নয় (জামালগঞ্জ কয়লার গভীরতা ৬০০ মিটারের বেশি বিধায় তা কোনো পদ্ধতিতেই উত্তোলনযোগ্য নয়)। তাহলে বাংলাদেশে কি কোথাও উন্মুক্ত কয়লা খনি করা সম্ভব নয়? বিষয়টির ওপর সরকার গঠিত বিশেষজ্ঞ দল প্রণীত প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় এনে কয়লা খনন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রের এক প্রান্ত বরাবর যেখানে কয়লার গভীরতা সবচেয়ে কম (১১৭ মিটার), সেখানে একটি উন্মুক্ত খনি করা যেতে পারে।

খালাশপীর ও দীঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্র ভূগর্ভস্থ খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব। কিন্তু বড়পুকুরিয়া ভূগর্ভস্থ কয়লা খনির অভিজ্ঞতায় মাত্র ২০ শতাংশ কয়লা আহরণ হবে বলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা সামগ্রিকভাবে কতটা অর্থনৈতিক লাভ বয়ে আনবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আবার ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি যে পরিবেশের ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাও নয়। ইতিমধ্যে বড়পুকুরিয়া খনির ওপর ভূপৃষ্ঠে জমি দেবে যাওয়ার ফলে অনেক এলাকাজুড়ে ফসলি জমি নষ্ট হয়েছে। সুতরাং একদিকে ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি নির্মাণের বিশাল ব্যয় ও তার বিপরীতে কয়লা মজুদের সামান্য অংশ উত্তোলন করার যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য কয়লা খনির স্থাপনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞ চালানোর জন্য মোক্ষম স্থান নয়। সম্প্রতি বিশ্বে কয়লা সরাসরি খনন করে ওঠানোর পরিবর্তে বিকল্পভাবে ব্যবহারের পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এ পন্থাটিকে বলা হয় ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ (underground coal gasification বা সংক্ষেপে UGC)। এ পদ্ধতিতে কয়লা না উঠিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে কূপ খনন করে কয়লার ভেতর বাতাস বা অক্সিজেন ও উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প ঢোকানো হয় ও উচ্চ তাপে কয়লাকে ভূগর্ভে প্রজ্বালন করা হয়। এর ফলে কয়লা থেকে একাধিক গ্যাস তৈরি হয়। যেমন হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি, যা কি না অপর একটি কূপ খনন করে ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসা হয়। আর এ গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, কলকারখানা ইত্যাদি চালানো যেতে পারে। ভূপ্রকৃতিতে বা সামাজিক পরিবেশের ওপর এ পদ্ধতির গ্যাস উত্তোলন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না বিধায় এ পদ্ধতিটি সম্প্রতি বিশ্বে বহু দেশে বিশেষ করে পরিবেশবাদীদের আকর্ষণ কেড়েছে। বর্তমানে যদিও কয়লার গ্যাস উত্তোলনের এই পদ্ধতিটির বাণিজ্যিক প্রয়োগ ব্যাপক আকারে প্রচলিত হয়নি, পৃথিবীর অনেক দেশেই এ রকম প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প চালু করার দিক থেকে দক্ষিণ অফ্রিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সে দেশে ২০০৭ সালে মাজুবা কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প চালু এবং সে গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে ক্ষমতা ১২০০ মেগাওয়াটে পৌঁছাবে। কানাডার আলবার্টা ও নোভাস্কোশিয়া প্রদেশে দুটি কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প চালু ও তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র চালানোর প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। কানাডার এরগো এক্সারজি কোম্পানি বাণিজ্যিক কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্প বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান পরামর্শক ও অপারেটর হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করে থাকে। দক্ষিণ অফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, নিউজিল্যান্ডসহ পৃথিবীর বহু দেশ পরীক্ষামূলক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প চালু করার কাজে অগ্রগতি অর্জন করছে। চীন ইতিমধ্যে ১৬টি পরীক্ষামূলক প্রকল্প শেষ করেছে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করছে। ভারত ইতিমধ্যেই রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে।

ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ প্রকল্পসমূহ যেভাবে বিভিন্ন দেশে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, তাতে মনে হয় যে এ প্রযুক্তি অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে কয়লা ব্যবহারের ধারা বদলে দিতে পারে। এতে করে কয়লা উত্তোলন নিয়ে ভূপ্রকৃতি বা সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সমস্যা থাকবে না। বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ কয়লা গ্যাসকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ জ্বালানি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে। এ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশকে এখনই পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

● ড. বদরুল ইমাম : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, রেজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়।